Article (Non-Research)

প্রতিধ্বনি the Echo
Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed Indexed International Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: https://www.thecho.in
ISSN: 2278-5264 (Online)
ISSN: 2321-9319 (Print)

বিজয় সরকারের বিচ্ছেদী গান : কান্নার স্থাপত্য

হীরামন পোদ্দার

Abstract

Sadness and Separation have always formed important aspects of human life through which man has expressed his inner feelings, be it spiritual or natural. The predominance of sadness and separation can well be perceived in literary works like Meghdut', 'Geet Gobindam', 'Charjhapad', 'Sreekrishnakirtan' Baisnab Kabya, Kabita, Mangal, Shakta, which are highly popular in Bengal. The incorporation of sadness and separation mark a significant element as regards wide acceptance of the compositions of 'Bauls' in Bengal. In the songs of Bijoy Sarkar also we find prevalence sadness and separation which have explicably contributed to their fascination and beauty. In fact, frustration of human heart, hopelessness, death, painful memory etc. have found substantial place in the compositions of Bijoy Sarkar; which added to his melodious voice have made his songs highly enthralling. The present paper tries to highlight the implication of sadness and separation in Bijay Sarkar's songs.

'বিচ্ছেদ' মানে মিলন সম্বন্ধের মধ্যে আপেক্ষিক দূরত্ব। সুতরাং বিচ্ছেদ অন্তত দুই না হলে হয় না। সংখ্যার দিক ২ কিংবা ২+ থেকে সরে এককে পরিণত হওয়া। বিশেষত এককের দিকে তার অভিযাত্রা।

আমাদের সংস্কৃতির যত অতীতস্তরে দৃষ্টি যেতে পারে, দেখা যাবে বিচ্ছেদ কিংবা বিরহেই নিজেকে জানান দিয়েছে মানুষ। পুরাণ হোক আর অধ্যাত্ম বা প্রাকৃত জৈবজীবন হোক; আদিমস্তর থেকে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় দুঃখ-বিচ্ছেদ-বিরহ মিশে আছে। বাংলা কাব্য-সাহিত্য বা শিল্পের বেদীমূলও বিরহের কুশাসন পেতে বসে নিজেকে জানান দিচ্ছে। 'মেঘদূত', 'গীতগোবিন্দম্' প্রভৃতি অতিক্রম করে বাংলার 'চর্যাপদ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', কথিত বৈষ্ণব কাব্য-কবিতা, মঙ্গল, শাক্ত, বাউল ইত্যাদি যা আছে দেখা যায় সবেরই মেদ নির্মাণ বিরহের দহন দিয়ে।

যুগে যুগে গানে গানে জেগে থাকা বিচ্ছেদ মুখ্যত কিছু বিষয় নির্ভর। এই অনুসারে দেখা যায় কয়েকটি রকম ফের : যেমন, ঈশ্বর থেকে বিচ্ছেদ, জগৎ থেকে বিচ্ছেদ, মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ, মনের মানুষের থেকে বিচ্ছেদ, চাহিদা আকাঙ্খা কামনার ধন থেকে বিচ্ছেদ, প্রেম-ভালোবাসার বিচ্ছেদ ইত্যাদি।

লোকগানে বিরহ এক অপূর্ব মাধুর্য উপহার দিয়েছে। বীণার তন্ত্রীতে যেমন আঘাত না করলে সুরের স্ফূরণ হয় না, তেমনি মনের তন্ত্রীতে আঘাত না হলে সত্য সুরটি ওঠে না। সেই কারণে প্রাকৃতিক, আধ্যাত্মিক, জৈবিক কিংবা লৌকিক – যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন বিরহ-চেতনা ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। লোকগানের শ্রেণিগত প্রায় সমস্ত ধারায় দুঃখের মাধুর্যই বিশেষ আসন পেয়েছে। বারোমাস্যা, ঝুমুর, দেহতত্ত্বের গান, ভাদু, টুসু, জারি, গীতিকা, ব্রত, বৈষ্ণব পদাবলী, নিমাই সন্ন্যাস, শাক্ত পদাবলী, মৈষাল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বিজয়গীতি – প্রভৃতি কোন গানে নেই?

বিচ্ছেদ – বিচ্ছেদ থেকে দুঃখযন্ত্রণা কথা ও সুরে সম্পৃক্ত হয়। এটাই বাঙালি ও বাংলার মর্মধ্বনি-স্বতস্ফূর্ত বিকাশ।

খাঁটি বিচ্ছেদী গান একটি বিশেষ পর্যায়ের গান। অনেকে মুখ্যত ভাটিয়ালি গানের রাজা বিজয় সরকারের গান-ই তার আশ্রয় বলে মান্য করেন। তাছাড়া, মৈমনসিংহ গীতিকা, রয়ানি, রাখালিয়া, বাইদ্যানী, ময়নামতী প্রভৃতি কতশ্রেণির লোকগানে বিচ্ছেদের রোদন ক্ষণে ক্ষণে। আবার বারোমাস্যার একটা পর্যায়কে নির্দেশ করেছেন কেউ কেউ। তর্ক-বাগীশ বাদানুবাদ এই আলোচনায় না গিয়ে প্রথম পদক্ষেপে বিজয় সরকারের কয়েকটি বিচ্ছেদমূলক গানের প্রথম ছত্র উল্লেখ করা যাক –

।।ক।। পরান কাঁদে তোমার লাগিয়া, কিশোর বাঁশরিয়ারে পরান কাদে তোমার লাগিয়া। (৩৯১ সংখ্যক / পৃঃ-২৯৫)

।।খ।। পরবাসী রে বড় ব্যথা দিয়ে গেলে আমার মনে আমার লয়ে যাবে তোমার দেশে রে
এই কথা ছিল তোমার সনে।। (১৯ সংখ্যক /পৃঃ-১৫)

।।গ।। প্রিয় মোর চলে গেছে রে ভাটীর নদীর মটর লঞ্চে
ও সেই নিদয়ের বিদায়ের ছবি রে
আছে অবিকল মোর হৃদয় মঞ্চে।। (৪৬ সংখ্যক / পৃঃ-৩৪)

।।ঘ।। ফাঁকি দিয়ে শ্যাম সুখ পাখি উড়ে গিয়াছে।
কুঞ্জ বনে শূন্য পিঞ্জর পড়ে রয়েছে। (১৩৩ সংখ্যক/ পৃঃ-৯৭)

।।ঙ।। আমি তোমায় ছেড়ে আর কত দিন রইব দুনিয়ায়
তোমা বিনা বৃথা জীবন যায়। (১২৭ সংখ্যক / পৃঃ-৯৩)

।।চ।। ও নবীন কিশোর রে, পরাণ কাঁদে তোমার লাগিয়া,
নবীন কিশোর রে। (১২৪ সংখ্যক / পৃঃ-৯০)

।।ছ।। আর কতকাল ঘুরব দয়াল, পথের কাঙাল হয়ে।
আমি কোন পথে যাই, তোমার কাছে রে
আমায় কেউ তো দেয় না কয়ে।। (৮৮ সংখ্যক / পৃঃ-৮৮)

--বোঝা যায় এই গানগুলো যেন জীবনের জ্বালামুখ থেকে গড়িয়ে পড়া লাভা। একান্তভাবেই মানবের ক্লান্ত-হিয়ার করুণ মিনতি। একে বুঝবার জন্যে আলাদা কোনো পাঠ নিতে হয় না। সংবেদনশীল মানুষমাত্রেই এর রসাস্বাদন করতে পারেন। বহুযুগের ওপার থেকে বিরহী আত্মা কেঁদে চলেছে চিরায়ত সুরে।

এক পলকে বিচ্ছেদী বা বিরহ গানের কিছু বিশিষ্টতা উল্লেখ করা যায় –

।।১।। এ গান একান্তভাবেই লৌকিক প্রেমের গান। জীবনের তাজা রক্তরাগে ফুটে ওঠে।

।।২।। এ সুরের নির্দিষ্ট একটা নক্সা আছে।

।।৩।। এ গান একক কণ্ঠের গান। কোনো দোসর নেই।

।।৪।। অনেক সময় তাল ছাড়া গাওয়া হয়।

।।৫।। সমস্ত বিরহী আত্মার অন্তর্লীন বিরহ অনুভবের সাঙ্গীতিক বহিঃপ্রকাশ।

।।৬।। মানব-প্রেমিক বা দয়িত কিংবা কাঙ্ক্ষিত পুরুষ ছাড়া আর কেউ এর নায়ক হতে পারে না।

।।৭।। তত্ত্বকথার অনুশাসন একেবারেই নেই। বড়জোড় কচ্চিৎ-কখনো রূপক প্রতীকের আশ্রয় নেওয়া হতে পারে।

।।৮।। দীর্ঘায়িত বিলম্বিত বা প্রলম্বিত সুর ব্যবহারের ঝোঁক বেশি।

।।৯।। সুরে থাকবে দুঃখ-বিরহ-কান্না-অশ্রু ভারাক্রান্ত আবেগ-আবেশ আচ্ছন্নতা।

।।১০।। বাক্য বা চরণ সর্বদাই সহজ সরল অনাবিল স্বতঃস্ফূর্ত।

।।১১।। ক্ষণস্থায়ী মিলনের স্মৃতিকণা বিরহে আরও ঘনীভূত করে তোলার প্রয়াস থাকে।

।।১২।। একাকীত্ব এতটাই ভাবাতুর করে যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেকার অতলান্ত বিরহ-যন্ত্রণার দ্বার আপনি খুলে যায়।

।।১৩।। বিরহই এ গানের একমাত্র সিদ্ধরস।

।।১৪।। সুরকে টেনে প্রলম্বিত যেমন করা হয়, তেমনি শুরুর লাইনে এবং স্তবকের চরণান্তিকে 'রে' উচ্চারণের এক বিশেষ রীতি দেখা যায়।

।।১৫।। এ গান কোনো সম্প্রদায়ের নিজস্ব নয়, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের।

।।১৬।। এ গান প্রাণতাপে এবং সম্পূর্ণ লৌকিক মানব-মানবীর দেউলিয়া দহনের নির্যাস।

।।১৭।। এ গানগুলি পাঠ করলেও বোঝা যায় বিরহই শুধু নয় বিরহ-শ্রেষ্ট আইডিয়ার কাব্যনির্মাণ। এর সাহিত্যমূল্য অবশ্যই অমরত্বের দাবি করে।

উল্লেখ্য বৈশিষ্টের নিরিখে বলা যেতে পারে বিজয় সরকারের বিচ্ছেদী গান শ্রোতার মনে জাগিয়ে তোলে অপূর্ব এক মাধুর্য। বিষন্নতার। দুঃখের। বিরহের। হারানোর। নাই নাই হাহাকারের। দূর দূরন্তের।

কেন হয় এমন?
মাঝে শূন্যতা আছে বলে।
'মাঝ' কেন?
-'দুই' আছে বলে। দুই এর মাঝে বিচ্ছেদ-শূন্যতা আছে বলে।
আর দুই আছে বলেই প্রেম।

- প্রেম এক স্বপ্নের মায়ামৃগ। তার ঠিকানা দরদী মানুষের মন। সেখানে মিলন সত্য – বিচ্ছেদও সত্য। বিজয়ের গান ঐ মিলনের উত্তর মেঘ – বিচ্ছেদের সর্বস্ব। বিচ্ছেদ আবহাওয়াতেই তার জন্ম এবং একান্তভাবেই লৌকিক প্রেমের আধারে সৃষ্ট।

ঐ গানগুলির মধ্যে না পাওয়ার তীব্র বেদনা স্তরে স্তরে ছড়ানো। নিঃসঙ্গতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে। সে গান শুধু হাহাকারের সুর-সর্বস্ব নয়, আবার শুধু কথা সর্বস্ব নয়। যদিও গুনগুন সুর শুনেও তা বুঝতে পারা যায় সে – বিজয়গীতি কিনা এবং কথা শুনেও বুঝতে পারা যায়। বোঝা যায় বলেই সিদ্ধান্ত করা যায় বিজয়ের গানের একটি নিজস্ব স্টাইল বা ঘরানা আছে। সুতরাং কথা এবং সুর একেবারেই নিজস্ব নিজ নিজ। এবং সত্তার স্বরূপে সে স্বতন্ত্র। কি বাণী কি সুর মাধুর্যে।

'ঘরানা' কথাটির কিছু অর্থ বহন করে। যেমন বংশ বা বংশজাত। ঘর থেকে ঘরানা। সংস্কৃত গৃহ (গ্রহ+অ+ক) থেকে ঘর। গৃহ হল ধারণ, স্থিতি, উৎস, অভিনিবেশ, গ্রহণ, আকর্ষণ, বোধ, জ্ঞান, আসক্তি ইত্যাদি অর্থবোধক। ঘরানা হল – রীতি বা শৈলী।

স্রষ্টা, সৃষ্টি, পরিবেশন এবং গ্রহীতা (শ্রোতা) – এই চতুরঙ্গের সংশ্লেষে তৈরী ঘরানা। বিজয় সরকারের ঘরানা নিষ্ঠুর যন্ত্রণার। এ বিচ্ছেদ কেবল এক পক্ষের নয়। উভয়পক্ষের। বিচ্ছেদরিক্ত যন্ত্রণার অনুরণন সংগোপনে মনের মধ্যে দাবদহন সৃষ্টি করে। বাইরের ধারাবর্ষণে সে শান্ত হবার নয়। ক্ষুধার আগুন যেমন বর্ন-শ্রেণি-লিঙ্গ-ভেদ মানে না, তেমনি যন্ত্রণা এর পরিণাম। এই বিচ্ছেদের যন্ত্রণা পাখির ডাকের মধ্যেও খুঁজে পায়। খুঁজে পায় শোকাতুর গল্প কথা –

"ও বউ সরষে কোট,
বিমনা বনের পাখিরে কেন তুই ডাকিস অমন করে।
তুই কি হারায়ে ডেকে ফিরিস সারাজীবন ভরে।
ও বউ সরষে কোট.....।
গ্রীষ্মকালে সরষে ভিজায়ে কোন সে কুলের বউ
কালের ডাকে চলে গেল সে ফিরাতে নারিল কেউ
তার ভিজানো সরষে রয়েছে পড়িয়ে আর ঢেঁকি নোট।" (বিজয়গীতি – ২৬৬, পৃঃ ১৯৭)

- উন্মাদিনী প্রেমিকা বধূ যেন নিজেরই ছবি কল্পনা করেছে এ গানের ভিতর দিয়ে। যেন একদিন সেও কালের ডাকে হারিয়ে গেলে কোন পাখি অমনি ভাবে বনে-বনে ডেকে ফিরবে – ও বউ সরষে কোট। এ পল্লিবধূর বেদনার কথা, সেই বধূকে হারাবার শূন্যতা, গৃহস্থের আম-জাম-কাঁঠাল পাতার আড়ালে হেসে খেলে বেড়ানো পাখীটির মতো অত গভীরভাবে আর কে বুঝবে? বাঙলার পাখির সাথে পল্লিবধূর এমন মরমি সম্পর্ক, এমন নিবিড় সংযোগ, অসাধারণ চিত্রকল্প বিজয়ের গানে ফুটে উঠেছে।

নিজের বুকের মধ্যে যে বেদনা গুমরে মরে বিশ্বময় তারই ছবি প্রত্যক্ষ করতে প্রতীক্ষা ব্যাকুল হৃদয় একদিন সঠিক ভাবেই উপলব্ধি করতে পারে - এই বিচ্ছেদই হল চিরন্তন সত্য। মিলন শুধু স্বপ্নমাত্র। সে গেয়ে ওঠে -

"আমার মনে মেনেছে, আমার জানে জেনেছে
তুমি আসবে না -
নয়ন ছাড়ে না তবু পথ চাওয়া।" (ঐ-২৬, পৃঃ ২০)

- চোখ ও মনের চিরন্তন দ্বন্ধকে মরমি কবি কি অসাধারণ নৈপুন্যে তুলে এনেছেন। তুলে এনেছেন আশার ছলনা, যা নিয়ে মানুষ বাঁচে। প্রতীক্ষায় দীর্ণ এক সময় প্রেমাস্পদকের আসামির কাঠগড়ায় তোলে। তাকে ভালোবেসে নিজের যে করুণ পরিণতি ঘটেছে তার জন্য পরবাসী বন্ধুকেই দায়ী করে সে -

"বড় ব্যথা দিয়ে গেলি রে পরানে
পর কাঁদানো পরবাসিয়া,
আমি কি ছিলাম আর কি হয়েছি,
বন্ধু তোরে ভালোবাসিয়া।" (ঐ-৬৪, পৃঃ ৭৩)

- শেষ জীবনের সমস্ত আক্ষেপ উজাড় করে, আকাশে-বাতাস মথিত সুরে নিজেকে একান্ত ভাবে উন্মোদিত করে নিজের শেষ ইচ্ছাটাকেই যেন ব্যক্ত করে সে -

"পরবাসী হইয়া রে রব আর কতকাল পরের জ্বালা সইয়া রে
আমার পাঁজুর ভাঙা বুক জুড়াব তোমার পরশিয়া রে"। (ঐ-১১, পৃঃ ৯)

- 'পাঁজর ভাঙা বুক জুড়াব' কথাটির মধ্যে যে আবেগ, যে বাক্‌রীতি লক্ষ্য করা যায় তা একান্তই বাংলার। বৈষ্ণব পদাবলির কবিরা এবং অন্য যাঁরা প্রেমের পদ রচনা করেছেন তাদের কল্পনার অধিকাংশ ঘটনাভুমি বৃন্দাবন বা কোন অতি প্রাকৃতধামে। কিন্তু বিজয়ের নায়ক-নায়িকা সুপষ্টভাবেই বাংলার মাটিতে নিজেদের উন্মোচিত করছে। এখানে নদী, গাছপালা, বনলতা, পাখি সবই বাংলার ভাটি অঞ্চলের। সেই জল-মাটি থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করার কোন উপায় নেই।

কবি বিজয় সরকার পার্থিব প্রেমের 'চিরস্মরণীয় প্রেমকথা' তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে স্মরণ ও নবমূল্যায়ন করে সেই প্রেম কাহিনিকে সাধারণ মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছেন। নর-নারীর প্রেমবিরহ, প্রকৃতির শোভা, প্রকৃতির প্রেমে উৎসারিত মানবমন, প্রেমের প্রতিকৃতি স্থাপন করা ইত্যাদি ছিল তাঁর গানের মৌলিক কাঠামো। বিচ্ছেদমূলক গানে গ্রাম্য পরিবেশের যে সহজাত ভাবটি কবি পরিস্ফূট করেছেন তা যেন জীবন্ত হয়ে মানুষের অন্তরে করুণ বেদনার সুরে বেজে উঠেছিল। "আসলে মানুষ চিরবিরহী। বিরহ মানুষের স্বভাব ধর্ম। আর সে কারণে মানুষ, প্রেমিক মানুষ বিরহ ব্যথায় পুড়তে পুড়তে খাঁটি সোনাতে পরিণত হয়"। যে বিরহ বিচ্ছেদ গান রচনা করে কবি বিজয় সরকার গীতিকার হিসাবে অধিক পরিচিতি লাভ করেছেন তার কয়েকটি পংক্তি নিম্নে উদ্বৃত হল ---

"আমার পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনি
একদিন ভাবি নাই মনে
সে কি আমায় ভুলবে কখনো।।
খেলত পাখি সোনালি খাঁচায়
বলত কতো কি আমায় বসে রূপালি আড়ায়
স্ফটিকের বাটি ভরে কতো খাবার দিতাম থরে থরে
নিঠুর পাখি খাই তো আনমনে।।
জংলা পাখি করল সর্বনাশ এখন শুধু হাই হুতাম
কোথায় করব তার তালাশ
বনের পাখি বনে গেল আমার বুকে দিয়ে বিষম শেল
তবে আর কি ফিরে পাব জীবনে।।
আগে যদি জানতাম পাখির মন ও সে করিবে এমন

তারে দিতেম না এ মন
কে এমন দরদি আছে বলে দিবে আমার কাছে
পাখি আমার গেছে কোন বনে।।" (ঐ-৬, পৃঃ ৪)

- উল্লেখিত গানের কথাতে প্রিয়াকে পোষা পাখির উপমায় তুলনা করা হয়েছে। প্রেমিক মন প্রেমিকার বিয়োগ যেভাবে অস্থির চিত্তের ভাবনায় ছটফট করা তা এ গানে বিধৃত করা হয়েছে। এই গানের পরিপূরক আরও কিছু গান তিনি রচনা *করেছেন। বছর ঘুরে এলে আমরা শুনতে পাই –*

"ও নিঠুর শ্রাবণরে, ও তুই আবার কেন
এলিরে এই দেশে।
তোর এক প্লাবনে পড়ে আমি রে
আমি, আজও বেড়াই ভেসে .....।।" (ঐ-১৩, পৃঃ ১০)

আরেকটি শ্রাবণের ঝরঝর বাদল ধারায় কবি গেয়ে ওঠেন –

শ্রাবণের বাদল ধারে রে, বরষার বারিধারে
কারে আজ চাহে রে আমার মনে।

.....
চাতল দীঘির চারিপাশে চাতকের চাতুরি,
জঙ্গল মাঝে বরষা মঙ্গল গাহিছে দাদুরি,
ও সেই শ্রাবণের মাধুরি;
আমি একা একা ঘুরে মরি
দূরের এক সুরের টানে।।" (ঐ-১৭০, পৃঃ ১২৫)

শুধু শ্রাবণ নয় বাংলার ভরা বর্ষাকালটাই কাঁদায় কবিকে। ভরা ভাদরের বৃষ্টিভেজা হিজল গাছ আর জলের উপর ঢেউ খেলে যাওয়া সবুজ ধানের সৌন্দর্য যেমন তাঁর মন ভরায় তেমনি সেই সুন্দর বর্ষণ মুখর দিনের একাকীত তাঁকে বেদনাক্রান্ত করে তোলে :

ভাদর ভরা বিলের মাঝে ছাড়া ভিটের পর
হিজল গাছ ভিজিছে জলে বৃষ্টি ঝরঝর;
পানসী নৌকায় খাটায়ে পাল, কত মানুষ গাহে ভাটিয়াল গো .....
হিজল ফুলের গন্ধে মাতাল উদাসী উতল হাওয়া।।
বাদল বাউল মেতেছে তার প্রাণের গান গেয়ে
ধানের খেতে নাচিছে এক দুদালী মেয়ে,
সবুজ ভরা যৌবন অঙ্গে, কবে মিলিবে সোনালী রঙ্গে,
আমার জীবন মিলন ভঙ্গে, বিরহ ব্যথার ছাওয়া।।" (ঐ-২৬, পৃঃ ২০)

পাগল বিজয় প্রকৃত পক্ষে বিরহের কবি, ব্যাথা ও বেদনার কবি। আসলে ব্যথাতেই সুখ পান তিনি। তাঁর প্রতিটি গানেই যেন অনুভূত হয় 'সুখের মতো ব্যথা'। তাই 'সুখ বসন্ত সুখের কালেও'। তিনি বেদনার গান শোণান।

অন্য একটি গানে তিনি লিখলেন –

শিকলি কেটে গেলি পাখি এলি না খাঁচায়।
বাটি ভরে খাবার দিবরে পাখি, ফিরে আয় ফিরে আয়রে।।
তোরে পুষে এই হল লাভ আমার কেঁদে দিন ফুরায়।।
মন পোড়ানো আগুন জ্বেলে, পাখি পালিয়েছে খাঁচা ফেলে,
সেই খালি খাঁচার দিকে চাইলে, আমার পরাণ উড়ে যায়।।" (ঐ-৬৩, পৃঃ ৪৭)

এই রকম তাঁর অধিকাংশ গানের মধ্যে ফুটে উঠেছে দুঃখ বেদনার হাহাকার। তাই ঈশ্বরের কাছে কোন অভিযোগ নয় অভিমানই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর গানে রোমান্টকতা এবং প্রকৃতি প্রেম মিলে মিশে

অন্যতর এক ভুবন তৈরি করেছে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করলে বোঝা যায় শোক এবং দুঃখ জগতের একটি বড় সম্পদ এর মধ্যে দিয়েই মানুষকে চলতে হয়।

তাই তাঁর রচিত গান শুধু মানুষের জন্য নয়। পুরুষ এবং প্রকৃতি মিলেই এই জগৎ সংসার। কখনও প্রকৃতি বিমুখ হলেই পুরুষের জীবনে নেমে আসে ঘোর প্লাবন। এই মায়াময় জগতে বাস করে তিনি দিব্যধামবাসী জ্যোতির্ময়ী পুরুষের সন্ধান পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন - 'কাজের শেষে সাঁজের বেলা মনের সাথে করি খেলা।' এইখানে কবি সকলের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

তিনি আরেকটি বিচ্ছেদমূলক গানে বলেছেন,--

"তুমি জানো না তুমি জানো না রে প্রিয়,
তুমি মোর জীবনের সাধনা,
তোমায় প্রথম যে দিন জেনেছি মনে আপন মেনেছি,
তুমি বন্ধু আমার মন মানো না।।
সেদিন ফাল্গুনও দোল পূর্ণিমায়, মৃদুল মিঠাল বায়
ফুল বনে পুলকের আলপনা -
সেই মধুর মাধবী রাতে, বধুয়া তোমারি সাথে,
আমি করেছিলেম সে যামিনী যাপনা।।
তুমি চলে গেলে আমায় ফেলে, কী আগুন এই বুকে জ্বেলে,
একদিনও দেখিতে তুমি এলে না।
তোমায় পেলে মোর দুঃখের কুটিরে, দেখাইতাম বক্ষ চিরে,
বুকের জ্বালা মুখে বলা চলে না।।
কাষ্ঠযোগে দাবানল, জ্বালিয়ে পোড়ায় বন জঙ্গল
মন পোড়ানো আগুন বন্ধু তাহা না;
কত বিরহীর অন্তরতলে বিনা কাষ্ঠে আগুন জ্বলে
জ্বলে গেলেওএকি যাতনা।" (ঐ-১৭, পৃঃ ১৩)

উক্ত গানে কবি বিজয় সরকার প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে প্রিয়ার জন্য বিরহ যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি প্রকাশ করেছেন, তাঁর মনের এই অস্থিরতা গানের প্রতিটি চরণে ফুটে উঠেছে। মানসপ্রিয়ার স্মৃতি জাগরণে তিনি বেদনায় মর্মাহত হয়ে উঠেছেন। এ যেন বৈষ্ণব পদাবলীর রাধিকার মত। কৃষ্ণ মথুরায় চলে যাওয়ার ফলে বৃন্দাবন হয়ে পড়ে শূন্য। কৃষ্ণ বিরহে শ্রীরাধা স্বয়ং এবং তাঁর সঙ্গে বৃন্দাবনবাসীর জীবন হয়ে উঠে শূন্যময়। এই পর্যায়ের রস করুণ এবং তা চিরবিচ্ছেদ জনিত বিরহের অর্ন্তগত। এই বিরহের দুঃখ বা বেদনা অন্তহীন তাই বিজয়ের এই গানটিতে ফাল্গুনের দোল পূর্ণিমার মিষ্টি বাতাসে কিংবা মধুর মাধবী রাতে প্রিয়ার সঙ্গ তাকে কতটুকু আনন্দ ভরিয়ে তুলেছিল তার বর্ণনা এ গানটিকে শাশ্বত প্রেমের বিরহবোধের সত্তায় উজ্জীবিত করেছে। আবার বিচ্ছেদমূলক ভাবদর্শন অনেকাংশে মরমিবাদের মৌলিকত্বের বিশ্লেষণে জীবনদেবতা ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে রচিত বলে ধারণা করা যায়। তাই কবিমানসের প্রেমসত্তা পরম সত্তায় ধাবিত হওয়ার প্রসঙ্গটি বিজয় সরকার অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট গানে আরোপ করেছেন।

এখানে তিনি আবাহন করেছেন সেই 'জীবনদেবতা' তথা ঈশ্বরকে। এখানেই 'বিজয় সরকারের মানিবীয়বোধের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরবোধের অনন্য প্রকাশ। গানের পরবর্তী স্তবকে বলতে চেয়েছেন যে প্রাণ প্রিয়কে পেলে তিনি তাঁর দুঃখের জ্বালা বুক চিরে দেখাবেন। কারণ এ দুঃখ মুখের ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আবার কাঠে লাগানো জ্বলন্ত আগুন যে রূপে সমগ্র বনজঙ্গল পুড়িয়ে দেয় কিংবা যে দাবানল জ্বলে নিভাবো যায় না, তেমনি প্রিয়র বেদনায় কবিমনে সে রূপ দাবানল জ্বলে উঠেছে। যা দমন করা যায় না। এ যাতনায় কবি জর্জরিত হয়ে উঠেছেন। এভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর অনন্য বিচ্ছেদমূলক ভাবসৌন্দর্য্যের প্রভাব তাঁর গানের অনেকাংশে ব্যবহৃত হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১। বন্দোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চতুর্থ খন্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৯৫ খ্রিঃ।
২। বৈরাগ্য বিরাট, মতুয়া সাহিত্য পরিক্রমা, মতুয়া গবেষণা পরিষদ, হৃদয়পুর, শ্রাবণ ১৪০৬, পৃঃ ৫৭১।
৩। হোসাইন মহসীন, কবি বিজয় সরকারের জীবন ও সঙ্গীত সমগ্র, জ্যোতিপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃঃ ২১।
৪। সরকার অশ্বিনী কুমার, শ্রীশ্রীহরি সঙ্গীত, ঠাকুরনগর, ২০০৮, পৃঃ ৭২।
৫। ঠাকুর কপিলকৃষ্ণ ও বিশ্বাস গোপাল, সম্পাদিত, বাংলার কবিগান ও লোককবি বিজয় সরকার চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, পৃঃ ৯৯।
৬। জসীমুদ্দীন, জীবনকথা, পৃঃ ১২৬।
৭। বিজয়গীতি, ৫ম সংস্করণ, ২০০৬।
৮। চৌধুরী আবুল আহসান, লালন সাঁই, গাঙচিল, ৭৮ সংখ্যক, পৃঃ ২০৪।
৯। সিংহ ড. দীনেশ চন্দ্র, পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা, পৃঃ ৯২।
১০। পোদ্দার অরবিন্দ, মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ, দ্বিতীয় সংস্করণ কলকাতা, ১৯৫৮, পৃঃ ২৫৮।

সহকারী শিক্ষক-গণদীপায়ন লালবাহাদুর স্মৃতি বিদ্যাপীঠ, পোঃ গণদীপায়ন, হাওরা, উত্তর ২৪ পরগণা।
গবেষক-রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।